রুকনিয়াতের আসল চেতনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

রুকনিয়াতের আসল চেতনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

রুকনিয়াতের আসল চেতনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক ঃ আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ - ১৯৯৮

১১তম মুদ্রণ ঃ আগস্ট - ২০১৪
ভাদ্র - ১৪২১
শাওয়াল - ১৪৩৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

প্রকাশকের কথা

আম্বিয়ায়ে কেরামদের (আ.) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা অনুসরণ করেই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ জমিনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাফেলার মূল শক্তি হল সদস্যগণ (রুকন)। দ্বীন কায়েম করাই যাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তথাপি মানবিক দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো কারো কারো মাঝে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের দিক নির্দেশনা দিয়ে ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ ডিসেম্বর টঙ্গীস্থ জামেয়া ইসলামীয়ায় (বর্তমান তা'মিরুল মিল্লাত টঙ্গী শাখা) কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলনে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম যে ভাষণ প্রদান করেন "রুকনিয়াতের আসল চেতনা" বইটি তারই বর্তমান সংস্করণ। ইতোমধ্যে বইটি ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। আশা করি বইটি অধ্যয়ন করে সদস্য (রুকন) ও কর্মীগণ ইসলামী আন্দোলনের চলার পথে নূতন প্রেরণা লাভ করবেন।

সূচিপত্র

- ইসলামী আন্দোলনের মর্মকথা ৫
- আল্লাহর আইন-বিধান অন্য সমাজ ব্যবস্থার অধীনে চলতে পারে না ৫
- জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ৬
- তবু রুকনদের মান কমে কেন? ৬
- আল্লাহর পক্ষ থেকে কেন পরীক্ষা করা হয়? ৭
- পরীক্ষার মাধ্যমেই রুকনিয়াতের মান বৃদ্ধি পায় ৮
- রুকনিয়াতের আসল চেতনা ৮
- প্রথম চেতনা ঃ দ্বীনী যিন্দেগীর তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়? ৯
- দ্বিতীয় চেতনা ঃ মান কমে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা ১১
- তৃতীয় চেতনা ঃ ছাটাই থেকে সাবধানতা ১১
- চতুর্থ চেতনা ঃ সত্যের সাক্ষ্য দেয়া ১৩
- পঞ্চম চেতনা ঃ আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা ১৪
- এ সব চেতনার সুফল ১৪
- কর্মীদের জন্য আদর্শ হতে হবে ১৫
- রুকনিয়াতের দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ ও চেতনাবোদের অভাবের নমুনা ১৫
- আল্লাহর দরবারে ধরনা ১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী আন্দোলনের মর্মকথা

"ইসলামী আন্দোলন" জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহরই সার্থক বাংলা অনুবাদ। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যারাই ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে চান তাদেরকে নবী-রাসূলগণের পরিচালিত আন্দোলন থেকেই আদর্শ ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশাল সৃষ্টি জগতের ছোট বড় প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে বিধান তৈরি করেছেন তা তিনি তাদের উপর চালু করেন। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ তাঁর বিধান অমান্য করার কোন ইখতিয়ার দেননি। এমনকি মানুষের শরীরের জন্য যে বিধি-বিধান তিনি রচনা করেছেন তা অমান্য করার সাধ্যও মানুষের নেই। মানবদেহসহ সকল সৃষ্টির জন্য রচিত বিধান রাসূলের নিকট পাঠানো হয়নি। এসব নিয়ম, বিধান ও আইন আল্লাহ স্বয়ং জারী করেন।

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে বিধান রচনা করেছেন তা রাসূল (সা) এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এসব আইন-বিধান আল্লাহ নিজে জারী না করে রাসূল (সা) ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এটাই আল্লাহর প্রতিনিত্বি বা খিলাফতের দায়িত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধানকে কায়েম করার চেষ্টা করাই হলো খলীফার কাজ।

আল্লাহর আইন-বিধান অন্য সমাজ ব্যবস্থার অধীনে চলতে পারে না

মানুষকে আল্লাহ তাঁর আইন মেনে চলতে বাধ্য না করার কারণে সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী মানুষ আল্লাহর আইনকে পাশ কাটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদের মনগড়া আইন চালু করে। তাই সকল মানবসমাজেই কোন না কোন বিধি-বিধান অবশ্যই চালু আছে। বিধানশূন্য কোন সমাজ নেই।

যুগে যুগে যখনই কোন নবী দেশবাসীকে আল্লাহর আইন কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন তখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা পূর্ব প্রচলিত আইন বহাল রাখার উদ্দেশ্যে নবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এভাবে চিরকাল হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ চলে এসেছে। এ সংগ্রামের নামই ইসলামী আন্দোলন। কুরআন পাকে বহু নবীর যুগে সংগঠিত সংঘর্ষের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বেঁচে থাকতে পারলেও জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম মানব-রচিত বিধানকে উৎখাত করা ছাড়া কায়েম হতে পারে না। জনগণের মধ্যে যদি উল্লেখযোগ্য শক্তি সক্রিয়ভাবে ইসলামী আইন চালু করতে এগিয়ে এসে কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় তবেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

নবী-রাসূলগণের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা অনুসরণ করেই জামায়াতে ইসলামীর কাফেলা বাংলাদেশে কর্মরত রয়েছে। ইসলামকে মানব সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্য রাসূল (সা) যেমন প্রথমে এমন একদল লোক তৈরি করলেন যারা তাদের জীবনে ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলতে প্রস্তুত; তেমনিভাবে জামায়াতও তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচির মাধ্যমে লোক তৈরির সাধনা করে চলেছে। যারা জামায়াতের দাওয়াত কবুল করেন তাদেরকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর করা হয়। এরই এক পর্যায়ে তাঁরা রুকন হিসাবে গণ্য হন। যারা ফরয ও ওয়াজেব পালন করেন, হারাম থেকে বেঁচে চলেন, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন, ইসলামকে কয়েম করাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ –

বলে শপথ গ্রহণ করেন তাদেরকেই জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসাবে গণ্য করা হয়।

রুকন হওয়ার পর তাদের দ্বীনী যিন্দেগীতে যাতে আরও উন্নতি হয় এবং তাদের মান যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট কর্মসূচি দেয়া হয়। তাদেরকে আত্মগঠন ও ব্যক্তিগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। রুকনিয়াতের শপথের সময় তাঁরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে সব ওয়াদা করেন তা সঠিকভাবে পালন করতে থাকলে তাদের মান বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

তবু রুকনদের মান কমে কেন?

যারা সহযোগী সদস্য থেকে রুকন মানে পৌঁছার জন্য বেশ কিছু সময় সাধনা করে নিজেদেরকে গড়ে তোলেন, দ্বীনের পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক রুকনের মান কমে যাওয়ায় তাদেরকে সামলে উঠার সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তাদের রুকনিয়াত বহাল রাখা যায়নি। হয় তাদের রুকনিয়াত বাতিল করতে হয়েছে অথবা তাদের নিকট থেকে ইস্তিফা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের যতগুলো কেস পাওয়া গেছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে রুকনিয়াতের মান কমার আসল কারণ দুটো ঃ-

(১) প্রথম কারণ ঃ রুকনিয়াতের শপথের সময় "আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য" একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে দুনিয়ার দাবী প্রাধান্য পেয়ে যায়। দুনিয়ার দাবী পূরণের জন্য আমাদের যা কিছু করতে হয় তা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে করতে বাধ্য হই। কিন্তু বেঁচে থাকব একমাত্র দ্বীনের দাবী পূরণের জন্য। দ্বীনই মু'মিনের জীবনের আসল লক্ষ্য। 'ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী' বইতে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি হিসাবে যে চারটি গুণের কথা আলোচনা করেছেন এ গুণটিই চতুর্থ নম্বরে রয়েছে।

আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন এবং পার্থিব সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি যখন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং দ্বীনের দাবী যখন পেছনে পড়ে থাকে তখন মান কমাই স্বাভাবিক।

(২) দ্বিতীয় কারণ ঃ রুকন হিসাবে শপথের সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর বান্দাদের সামনে যে ঘোষণা করা হয় তা এত বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ঘোষণা যে এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন সময় আল্লাহ্ পাক বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কোন মুমিনকে তিনি বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেন না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْـوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ –

"আমি অবশ্য অবশ্যই ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফসলাদির ক্ষতি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। (বাকারা ১৫৫)

এ আয়াতে তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন বলে ডবল জোর দিয়ে বলেছেন এবং কিভাবে করবেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন। বাতিলের পক্ষ থেকে ভয় দেখানো হবে, হালাল পথে চলার ফলে দারিদ্র্য আসবে এবং জান ও মালের ক্ষতির কারণ ঘটবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে যেসব আপদ-বিপদ আসে এ সবের মাধ্যমেই পরীক্ষা করা হয়। সকলকে একইভাবে পরীক্ষা করা হয় না। যার মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে সেদিক দিয়েই পরীক্ষা আসে।

যখন পরীক্ষা আসে তখন সচেতন রুকন টের পেয়ে সাবধান হয়ে যায়। বিপদ-মুসীবত এবং কঠিন বাধা ও সমস্যাকে পরীক্ষা মনে করেই সবরের সাথে রুকনিয়াতের মান রক্ষা করার চেষ্টা চালায় যাতে পরীক্ষায় ফেল হয়ে না যায়। আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে ধরনা দেয়, যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দেন।

যারা পরীক্ষার ব্যাপারে সতর্ক নয় তারা বিপদ মুসীবতকে দ্বীনের কাজ না করার অজুহাত বা বাহানা মনে করে। তারা ভাবে যে "আমি এ অবস্থায় কেমন করে আগের মতো কাজ করব?" ফলে তাদের মান কমতে থাকে এবং পরীক্ষায় ফেল করে। ক্রমে রুকনিয়াতের নিম্নতম মানটুকুও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে হয় ইস্তিফা দেয়, আর না হয় তাদের রুকনিয়াত বাতিল করা হয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কেন পরীক্ষা করা হয়?

আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার দায়িত্ববোধ নিয়ে যারা রুকন হওয়ার হিম্মত করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন বোঝা বহনের জন্য রাযী। সূরা আন্নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা তাদের হাতেই এ পবিত্র দায়িত্ব অর্পণের ওয়াদা করেছেন, যারা এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য বিবেচিত হবে। এ যোগ্যতা যাচাই করার জন্যই আল্লাহ স্বয়ং পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

খিলাফতের এ দায়িত্ব যাদের উপর অর্পণ করা হয় তারা এত ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, তারা অবাধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জনগণের ওপর যুলুম, শোষণ ও নির্যাতন চালানোর সুযোগ পায়। তাই এ মহান দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তাদেরকে যাচাই করার প্রয়োজনেই আল্লাহ্ পাক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রাসূল (সা) তাঁর যে সাহাবীগণকে নিয়ে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করেন তাঁদেরকে বহু কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বাছাই করে নিয়েছেন।

তাদের শেষ পরীক্ষা ছিল হিজরাত। যারা নিজের বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করে দ্বীনের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করলেন তাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেয়া হলো। এসব পরীক্ষিত লোকদের পক্ষে আল্লাহর নাফরমানী করে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করা কি স্বাভাবিক? যারা দ্বীনের স্বার্থে নিজের সম্পদ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা কি দুর্নীতি করতে পারেন? যারা দ্বীনের খাতিরে আত্মীয় পরিজনকে ত্যাগ করে এসেছেন তারা কেমন করে স্বজনপ্রীতি করবেন?

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন কায়েম করার দাবীদারের হাতে বিনা পরীক্ষায় ক্ষমতা তুলে দেন না। তাই এ পরীক্ষা অপরিহার্য।

পরীক্ষার মাধ্যমেই রুকনিয়াতের মান বৃদ্ধি পায়

পরীক্ষায় যারা টিকে যায় তারাই আন্দোলনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যারা ছাঁটাই হয়ে যায় তারা এ পথে চলার যোগ্য নয়। যে সব ত্রুটি থাকলে রুকন রাখা উচিত নয়, সে সব কোন রুকনের মধ্যে পাওয়া গেলে প্রথমে তার রুকনিয়াত মুলতবী করে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। সংশোধন না হলে ইস্তিফা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। অথবা বাধ্য হয়ে রুকনিয়াত বাতিল করা হয়। এভাবেই রুকনগণকে ত্রুটিমুক্ত থাকার গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাকীদ দেয়া হয়।

যাদের উপর সংগঠনের আর্থিক দায়িত্ব থাকে তারা বিশেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হন। বাইতুলমাল, নির্বাচনী তহবিল, সংগঠনের পরিচালনায় কোন প্রতিষ্ঠানের ফান্ড ইত্যাদি আমানতদারীর দাবী পূরণ করতে অক্ষম হলেও ছাটাই করা হয়। এ জাতীয় সাংগঠনিক শৃংখলা মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

রুকনিয়াতের আসল চেতনা

যে দুটো প্রধান কারণে রুকনিয়াতের মান কমে যায় তারও মূল কারণ রুকনিয়াতের আসল চেতনার অভাব। ১৯৮৬ সালের রুকন সম্মেলনে রুকনিয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। ১৯৯২ এর সম্মেলনে জেলে থাকা অবস্থায়ই 'রুকনিয়াতের মর্যাদা' নামে একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম। এ দুটো বিষয় একই বইতে 'রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা' নামে জামায়াতের প্রকাশনা বিভাগ থেকে ছাপানো হয়েছে।

আজ বিশেষ করে রুকনিয়াতের চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করছি যার কোন কোন পয়েন্ট রুকনিয়াতের মর্যাদা শিরোনামে ভিন্ন আংগিকে উক্ত বইতে আলোচিত হয়েছে।

রুকনিয়াতের আসল চেতনার ব্যাখ্যায় পাঁচটি কথা পেশ করতে চাই ঃ

১. দ্বীনী যিন্দেগী তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়?

২. মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে সতর্কতা।

৩. আল্লাহর বাছাই ও ছাটাইনীতি সম্পর্কে সাবধানতা।

৪. জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব।

৫. আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা।

এখন এ ৫টি কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করছি ঃ

প্রথম চেতনা ঃ দ্বীনী যিন্দেগীর তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়?

জামায়াতের রুকন হিসাবে আমি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার দ্বীনী যিন্দেগী গড়ে তুলবার ব্যাপারে জামায়াতের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রথমে জামায়াতের মরহুম নেতা জনাব আবদুল খালেকের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে আমি সহযোগী সদস্য হিসাবে জামায়াতে শামিল হই। এরপর তারই প্রচেষ্টায় কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করি। জামায়াতের ইউনিট বৈঠকের মাধ্যমে ও জামায়াতের প্রচারিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ইসলামের এমন বিপ্লবী ধারণা পেলাম যা ঈমানকে শাণিত, ইলমকে সমৃদ্ধ ও আমলকে মজবুত করতে থাকল।

জামায়াতে আসার পূর্বে এ ধারণাই ছিল না যে ইসলাম একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকেই ইবাদাতে পরিণত করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা লাভ করতে হলে রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর অনুকরণে আল্লাহর বিধানকে কায়েম করার জন্য জান ও মালের কুরবানী পেশ করতে হবে। জামায়াতে এসে আরও জানতে পারলাম যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম না হলে পূর্ণ মুসলিম হিসাবে জীবন যাপনের সুযোগ হতে পারে না, ইসলামকে অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থার অধীনে কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য পাঠানো হয়নি, মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যই ইসলাম এসেছে। এক কথায় বলতে চাই যে, ঈমান, ইলম ও আমলের ময়দানে যতটুকু সামান্য অগ্রগতি লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তা জামায়াতের ইসলামীর আন্দোলনে শরীক না হলে কিছুতেই সম্ভব হতো না।

আমার সকল রুকন ভাই ও বোনই আমার এ সব কথা তাদের জীবনেও সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। জামায়াতে ইসলামীতে আসার আগে ইসলামের ভিন্নরূপ দেখেছি। ঐসব ঘাট পাড়ি দিয়ে জামায়াতকে পেয়েছি বলে এ সংগঠনের মূল্য আমার নিকট বিরাট। জামায়াতের দাওয়াত ব্যাপক হওয়ার পর যারা রুকন হয়েছেন তাদের কাছে জামায়াতের মর্যাদার উচ্চ ধারণা নাও থাকতে পারে। ইসলামের নামে হাজারো ফিতনার এ যুগে জামায়াতে ইসলামী যে আল্লাহ পাকের কত বড় রহমত তা তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম, যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন মত ও পথের চক্কর থেকে বের হয়ে এ পথে চলার তাওফীক পেয়েছেন। এ পথ না পেলে আমাদের কার জীবন কোন্ অবস্থায় কাটতো সে কথা ভাবলে আল্লাহর শুকরিয়ায় মাথা নত হয়ে আসে।

এ জামায়াতে শরীক না হলে আমরা দ্বীনী যিন্দেগীর কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করতাম এবং ঈমান, ইলম ও আমলের ময়দানে আমাদের মান কোথায় থাকতো সে কথা মনে করে আল্লাহ তায়ালার শেখানো ভাষায় বলতে চাই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়াত করেছেন। যদি

আল্লাহ হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না।" (সূরা আল-আ'রাফ- ৪৩)

জামায়াতে ইসলামী ধাপে ধাপে অগ্রসর করে যাকে রুকন বানায় তাঁকে দ্বীনী যিন্দেগীর কোন্ অবস্থানে পৌছিয়ে দেয় তা বুঝে নিতে হবে। সে অবস্থানটিকে কামিল মুমিনের সর্বনিম্ন স্তর বলা যায়। কারণ রুকন হওয়ার শর্ত শুধু ফরয ও ওয়াজিব মেনে চলা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা। সুন্নাত ও নফল পালন এবং মাকরূহ্ থেকে বেঁচে থাকার পর রুকন করা হবে বলে শর্ত রাখা হয়নি। যে ব্যক্তি ফরয-ওয়াজিব ঠিকমতো পালন করে না বা হারাম থেকে বাঁচার ব্যাপারে অবহেলা করে তাঁকে কামিল মুমিনের নিম্নমানে আছে বলেও মনে করা চলে না। কামিল মুমিন বিরাট ব্যাপার। রুকনের মানকে বড়জোর কামিল মুমিনের নিম্নতম মান বলা চলে।

দেশ ও সমাজের বর্তমান কলুষিত পরিবেশে বহু খাঁটি ঈমানদারও রুকন হওয়ার শর্তটুকু পূরণ করার হিম্মত করে না। ইসলামী আন্দোলনে মনে প্রাণে সক্রিয় এবং সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এমন অনেকেই রুকনিয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহস পান না। অনেকের নিকট রুকন হওয়া বিরাট কঠিন বিষয় মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা কামিল মুমিনের সর্বনিম্ন মান মাত্র।

দ্বীনী যিন্দেগীর তরক্কী ও উন্নতিকে একটি সিঁড়ির সাথে তুলনা করলে এ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ হলো সাহাবায়ে কেরামের মান। সর্বনিম্ন মান থেকে সর্বোচ্চ মানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সে হিসাবে এ সিঁড়ি অবশ্যই অত্যন্ত দীর্ঘ। জামায়াত যাকে রুকন বানাল তাঁকে এ দীর্ঘ সিঁড়ির মাত্র পয়লা ধাপে পৌছিয়ে দিল। এখন এ সিঁড়ি বেয়ে দ্বীনী যিন্দেগীকে উন্নত করার সাধনা করা রুকনেরই দায়িত্ব।

আত্মগঠনের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে ইলম বৃদ্ধি করতে থাকা, ফরয-ওয়াজিবের সাথে সুন্নাত ও নফলের অভ্যাস করা, আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য শেষ রাতে তাঁর মহান দরবারে ধরনা দিতে থাকা, লেনদেনে ওয়াদা রক্ষা করা, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি নিজের মনের তাকীদে যারা করতে থাকে তাদের দ্বীনী যিন্দেগী তরক্কী হওয়াই স্বাভাবিক।

আর ব্যক্তিগঠনের উদ্দেশ্যে আত্মীয়, প্রতিবেশী, পেশাজীবনের সংগী-সাথীসহ যাদের সাথেই দেখা-সাক্ষাত ও আলোচনার সুযোগ হয় তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো, যারা দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে দ্বীনের পথে অগ্রসর করার জন্য পেছনে লেগে থাকা এবং সম্ভাবনাময় ও যোগ্য লোকদেরকে সংগঠনভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দান করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায়। দাওয়াতে দ্বীনের কাজেই আল্লাহ পাক সবচাইতে বেশী খুশী হন এবং আনসারুল্লাহর মর্যাদা দান করেন।

আত্মগঠন ও ব্যক্তিগঠনের এ দু'দফা কাজ নিষ্ঠার সাথে করতে থাকলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর হেদায়াত পুস্তিকাটিকে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার অত্যন্ত বাস্তব ও চমৎকার উপায় এ বইটিতে শেখানো হয়েছে। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর "আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়" বইটিও এ বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক।

দ্বিতীয় চেতনা ঃ মান কমে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

যে দুটো মূল কারণে রুকনিয়াতের মান কমতে থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আত্মসমালোচনার সময় এ কথাটি প্রতিদিন খেয়ালে আনতে হবে যে আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে দুনিয়ার চেয়ে দ্বীনকে প্রাধান্য দিচ্ছি কি না। আর যখনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা আসে তখন সবরের সাথে তা মেনে নিয়ে আল্লাহরই দরবারে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করতে হব। সংগঠনের দায়িত্বশীল ও দ্বীনী ভাইদেরকে অবস্থা জানিয়ে দোয়া চাইতে হবে। আর দ্বীনের দায়িত্ব আরও বেশী ইখলাসের সাথে পালন করার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় চেতনা ঃ ছাটাই থেকে সাবধানতা

আল্লাহ তায়ালা এ গ্যারান্টি কাউকে দেননি যে একবার হেদায়াত হলে আর কখনো গুমরাহ হবে না। বরং মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার জন্য চেষ্টা করার সাথে সাথে দোয়া করার জন্যও কুরআনে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

"হে আমাদের প্রভু। তুমি যখন আমাদেরকে হেদায়াত করেছ তখন এ হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের দিলে কোনরকম বক্রতা সৃষ্টি হতে দিও না। তোমার দয়ার ভাণ্ডার থেকে আমাদের উপর রহমত নাযিল কর। একমাত্র তুমিই প্রকৃত দাতা।" (আলে ইমরান- ৮)।

হেদায়াত এত বড় নেয়ামত যে এর প্রতি অবহেলা করলে গুমরাহ হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই এর যে নীতি রয়েছে তাতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যখন কাউকে তিনি দ্বীনের পথে চলার সকল বাধা উপক্ষো করে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁকে আল্লাহ বাছাই করেছেন। আল্লাহর দেয়া পরীক্ষায় যখন কেউ ফেল করে এবং ধৈর্য্য ও সাহসের অভাবে দ্বীনের কঠিন পথে চলার হিম্মত হারায় তখন বুঝতে হবে যে সে ছাটাই এর মধ্যে পড়ে গেছে। সূরা আল-হজ্জের শেষ আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ -

"জিহাদের হক আদায় করে আল্লাহতে জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের পথে তোমাদের জন্য কোন বাধা থাকতে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের তরীকা।" (সূরা আল হাজ্জ- শেষ আয়াত)

সূরা আল হাজ্জের প্রথমাংশ হিজরাতের পূর্বক্ষণে নাযিল হয় এবং শেষাংশ হিজরাতের পর পরই নাযিল হয়। যারা সবকিছু ত্যাগ করে দ্বীনের খাতিরে হিজরাত করলেন তাদেরকে এ আয়াতে হক আদায় করে যে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এ মর্ম কী? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে সারা কুরআনে বহু আয়াতে "ওয়া জাহিদু ফী

সাবীলিল্লাহ" বলা হলেও এ আয়াতটিতে 'সাবীল' শব্দটি নেই। নিশ্চয়ই ভুলে বা অনর্থক 'সাবীল' শব্দটি বাদ দেয়া হয়নি। সূরা আন-নিসা ৫৯ নং আয়াতের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

এ আয়াতটিতে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে 'আতীউ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 'উলীল আমর' এর সাথে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এখানে যেমন অনর্থক 'আতীউ' শব্দ বাদ দেয়া হয়নি, তেমনি ঐ আয়াতেও 'সাবীল' শব্দ বাদ দেয়ার তাৎপর্য রয়েছে। এর সঠিক তাৎপর্য তো আল্লাহই জানেন। তবে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা যুক্তিপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।

সাবীল অর্থ পথ। আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার কথা বহু আয়াতেই আছে। এ আয়াতটিতে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার কথাও নেই। সাহাবায়ে কেরাম ১৩ বছর পর্যন্ত জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার পর সবকিছু ত্যাগ করে হিজরাত করলেন। তারা তো সব সাবীল পার হয়েই এসেছেন। শুধু জানটি নিয়ে জন্মভূমির মায়া এবং স্বজনদের আকর্ষণ ত্যাগ করে আল্লাহর হুকুম তামীল করলেন। এখন তাদেরকে আল্লাহর মধ্যে জিহাদ করার হুকুম করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর হুকুমে সবকিছু কুরবানী করে এসেছ। দুনিয়ায় তোমাদের চাওয়া ও পাওয়ার আর কিছুই নেই। তাই তোমরা আল্লাহময় হয়ে যাও, তোমাদের কামনা বাসনাকে আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করে দাও। ফালা ফিল্লাহ হয়ে যাও।

কারণ তোমাদেরকে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর বাছাই এর যোগ্য মনে করেই তোমাদেরকে হিজরাতের তাওফীক দিয়েছেন। দ্বীনের দাবী পূরণের ব্যাপারে কোন বাধাতে তিনি তোমাদেরকে আটকায় দেননি। বহু ঈমানদার তাদের দুর্বলতার কারণে হিজরাত করতে সক্ষম হয়নি। তোমরা এ জন্য সক্ষম হয়েছ যে, তোমরা আল্লাহর বাছাই এর মধ্যে গণ্য হয়েছ।

তোমাদের এই যে ত্যাগ ও কুরবাণী তা তোমাদের আদর্শিক পিতা ইবরাহীমেরই (আ) আদর্শ। তোমরাও তাঁরই কাছে আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে দুনিয়ায় সব কিছু কুরবানী দিতে সক্ষম হয়েছ।

এখান থেকে আমরা এ চেতনাই পাই যে, যারা ভয়ভীতি, লোভ-লালসা, আপদ-বিপদকে অগ্রাহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের কঠিন পথে মজবুত হয়ে টিকে থাকে তারাই আল্লাহ পাকের বাছাই এর মধ্যে গণ্য। আর যারা দুর্বলতার শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়ে তারাই ছাটাই এর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে ১১ কোটি মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এমন লোক রয়েছে যারা কুরআন হাদীসের ইলম, পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান, উচ্চ ডিগ্রী, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব ইত্যাদিতে আমাদের মতো রুকনদের

তুলনায় অনেক অনেক উন্নত। বিরাট বাতিল শক্তির মুকাবিলায় আমাদের মতো নগণ্য সংখ্যক লোককে

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

বলে আল্লাহর নিকট বাইয়াত হওয়ার তাওফিক দিলেন। আল্লাহর বাছাই এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেতনা যদি জাগ্রত থাকে তাহলে কখনো আমরা এ গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে রাজী হবো না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছাটাই থেকে হেফাজত করুন, কাতরভাবে এ দোয়াই করতে হবে।

চতুর্থ চেতনা ঃ সত্যের সাক্ষ্য দেয়া

আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের আওয়াজ তুলে কালেমার যে মহান পতাকা আমরা হাতে নিয়েছি, আমাদের বাস্তব জীবনে এর নমুনা যেন জনগণ দেখতে পায় সে বিষয়ে সিরিয়াস হতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন সাধনা করে সাংগঠনিক পদ্ধতির সাহায্যে আল্লাহর দ্বীনের আলো, ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যতটুকু হাসিল করতে পেরেছি, সাধারণ জনগণের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোকের পক্ষেই তা করা সম্ভব। তাহলে জনগণের পক্ষে দ্বীনের আলো পাওয়ার উপায় কী?

কুরআনে বিভিন্ন সূরায় ঈমানদার, সৎকর্মশীল ও আল্লাহর বান্দাদের যেসব গুণের বিবরণ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, অপরদিকে সর্বসাধারণকে একথা চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তোমাদের মতোই কতক মানুষ, তোমাদের সমাজেরই কতক লোক, যারা তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী, রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে এমন গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে যার প্রশংসা করতে তোমরা বাধ্য। মানুষ যতই মন্দ হোক সৎ গুণের অধিকারীকে বাধ্য হয়ে প্রশংসা করে। মানবিক গুণাবলীর অধিকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আমরা যে মহা সত্যের পতাকাবাহী আমাদের বাস্তব জীবন যদি ঐ সত্যের সঠিক সাক্ষ্য বহন করে তাহলে জনগণ অবশ্যই আকৃষ্ট হবে। তারা আমাদের জীবন থেকে ইসলামের প্রকৃত রূপ যদি দেখতে না পায় তাহলে শুধু আমাদের মুখের কথায় সাড়া দেবে না।

আমাদের রুকনিয়াত সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমাদের পরিচিত মহল আমাদের সম্বন্ধে এভাবে আলোচনা করবে ঃ "কেউ বলবে অমুকের মতো ভাল মানুষ আর দেখি না। এমন সৎ লোক পাওয়া বড়ই কঠিন। আর একজন বলবে এমন হবে না কেন, সে যে জামায়াতে ইসলামীর রুকন। এমন সৎ না হলে কি জামায়াত রুকন বানায়?"

আমাদের আচার ব্যবহার, লেনদেন, ওয়াদা পালন, মরজি, মেজায, দরদী মন যদি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হয় তবেই রুকন হওয়া সার্থক। রুকনদের চারিত্রিক মান এ পর্যায়ে পৌছলে জনগণের অন্তরে আস্থা ও আশার সঞ্চার হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। "সত্যের সাক্ষ্য" বইটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম চেতনা ঃ আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন- আদম সন্তান 'আমার আমার' বলে দাবী করে। অথচ তার শুধু ততটুকুই যেটুকু সে খেয়ে হজম করেছে, যে জামা গায়ে দিয়ে ছিঁড়েছে এবং যা আল্লাহর পথে খরচ করেছে। আর বাকী সবটুকুই তার মৃত্যুর পর অন্যদের হবে।

যেটুকু খাওয়ার পর হজম হয়নি তাও তার নয়। বমি বা দাস্ত হয়ে গেলে কুকুর-বিড়াল, মুরগী-কাকে খাবে। ছিঁড়ে যাওয়ার পূর্বে জামা অন্যের হাতেও চলে যেতে পারে। শুধু ঐটুকু নিশ্চিতভাবে তার যা আল্লাহর ব্যাংকে তার নামে জমা হয়েছে।

তাই রুকনদের এ ধান্দা থাকতে হবে যে, আল্লাহর ব্যাংকে তার একাউন্টে যেন জমার পরিমাণ বাড়তেই থাকে। আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ তো রুকন হওয়ার আগেই দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাই ইয়ানাতের পরিমাণ বাড়ানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নিয়মিত আয় ছাড়াও যখনই সামর্থ্য হয় তখনই আল্লাহর পথে দিতে থাকতে হবে।

পরিবারে প্রতিমাসে ভরণপোষণের জন্য যে অংকের টাকা আমরা খরচ করতে বাধ্য হই তা থেকে এমন পরিমাণ বাইতুলমালে দেয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন যাতে কুরবানী করার অনুভূতি টের পাওয়া যায়। এর জন্য একটা পরামর্শ রাখতে চাই।

ধরুন এক পরিবারের সদস্য ৭ জন। জামায়াতে ইসলামীকে যদি পরিবারের ১ জন সদস্য গণ করা হয় তাহলে ঐ পরিবারে ৮ জন সদস্য ধরা হবে। মাসে যে পরিমাণ শুধু খাওয়া-পরার জন্য খরচ হয় তা ৮ ভাগ করলে ১ ভাগে যে অংশ দাঁড়ায় সে পরিমাণ ইয়ানত দিলে পরিবারের খরচের যে চাপ পড়বে তাতে অনুভব করা যাবে যে আল্লাহর জন্য ঐটুকু ত্যাগ করা গেলো।

যে মাস আসলো সংসারের খরচ শুরু করার আগেই ঐ মাসের ইয়ানত আদায় করার অভ্যাস করলে ভাল হয়। এ জযবা নিয়ে তা করা যায় যে, আমি আল্লাহর পাওনা আগে শোধ করলাম এ আশায় যে, তিনি আমার আয়-রোজগার ও সংসারে বরকত দেবেন। রোগ-বালাই আপদ-বিপদ থেকে আল্লাহ যদি হেফাযত করেন তাহলেই তো সংসারে বিরাট বরকত হয়। আর এ ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে।

এ সব চেতনার সুফল

এ পাঁচটি চেতনা যদি আমরা সদা জাগ্রত রাখতে পারি তাহলে দ্বীনী তরক্কীর সিঁড়ি বেয়ে আমরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো ইন-শা-আল্লাহ। এ তরক্কীর কোন শেষ নেই।

কামিল মুমিন হওয়ার এ সাধনা অবিরাম চালাতে হবে। কোন অবস্থায়ই এ ধারণা করার সুযোগ নেই যে আমি কামেল হয়ে গেছি। এ ধারণা হওয়া মানেই অধঃপতন শুরু হওয়া। কারণ এ ধারণা হলে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা থেমে যাবে এবং পিছিয়ে যাওয়া শুরু হবে।

জ্ঞান অর্জনের বেলায় দেখা যায় যে, বি, এ, এম, এ বা ফাযেল, কামেল পাশ করলেই বিদ্যার সাগর হয়ে যায় না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এতটুকু বিদ্যা

হাসিল হয় যাকে ভিত্তি করে জ্ঞান সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার হিম্মত পায়। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের।

এমনিভাবে জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতির সাহায্যে রুকনিয়াতের ডিগ্রী পাওয়ার পর কামিল মুমিন হওয়ার পথে সাধনা করার হিম্মত পাওয়া যায়। যদি এ হিম্মতকে আমরা কাজে লাগাই তাহলে ইন-শা-আল্লাহ তরক্কী হতেই থাকবে। এটা সংগঠনের দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব রুকনের নিজের।

রুকন হওয়ার মানে হলো অটোমেটিক মেশিনে পরিণত হওয়া। জামায়াত তাকে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এখনও যদি তাকে রেলের বগীর মতোই টেনে নেওয়ার দরকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে আর ইঞ্জিন নেই বগীতে পরিণত হয়েছে।

রুকনের দায়িত্ব হলো নিজের চেষ্টায় দ্বীনী যিন্দেগীকে অবিরাম উন্নত করার সাধনা করতে থাকা এবং এ পথের ইঞ্জিন হিসাবে আরও অনেক লোককে বগীর মতো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রুকনিয়াতের চেতনা জাগ্রত থাকলে এ উভয় দায়িত্বই যোগ্যতার সাথে পালন করা সম্ভব।

কর্মীদের জন্য আদর্শ হতে হবে

আমাদের মান যদি উন্নত হয় তাহলে কর্মীরা আমাদেরকে আদর্শ মনে করবে এবং তাদের মধ্যে রুকন হওয়ার আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। আর তা না হলে আমরাই তাদের রুকন হওয়ার পথে বাধা বলে গণ্য হব। এদিক বিবেচনা করলে আমাদের দায়িত্বের উপলব্ধি অত্যন্ত গভীর হওয়া প্রয়োজন। আমরা আন্দোলনের জন্য যদি সম্পদ না হই তাহলে আপদে পরিণত হব। আমাদের উপরই আন্দোলনের অগ্রগতি নির্ভর করে।

তাই আপনাদের কাছে আমার আকুল আহ্বান যে, আসুন আমরা এ বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে এ সম্মেলনের জন্য আমরা সময়, শ্রম ও অর্থের যে কুরবানী দিলাম তা সত্যিকারভাবে সার্থক হবে।

রুকনিয়াতের এত গুরুত্বের কারণেই তিন তিনটি রুকন সম্মেলনে এ বিষয়ে আমি তিনটি বক্তব্য পেশ করা কর্তব্য মনে করেছি। ১৯৮৬ সালে "রুকনিয়াতের দায়িত্ব" ১৯৯২ সালে জেল থেকে পাঠানো "রুকনিয়াতের মর্যাদা" এবং ১৯৯৭ সালের এ সম্মেলনে "রুকনিয়াতের চেতনা" সম্পর্কে যে সব কথা পেশ করা হলো তা যদি আমরা নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলন করি তাহলে ইন-শা-আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দ্বীনকে কায়েম করার তাওফীক দান করবেন।

রুকিনয়াতের দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ ও চেতনাবোধের অভাবের নমুনা

যারা রুকনিয়াত থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইস্তিফানামা লিখে পাঠান, তারা যে ভাষায় লিখেন তা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, তারা এর দায়িত্ব, মর্যাদা ও চেতনাবোধ থেকে বঞ্চিত। হঠাৎ করে আবেগ তাড়িত হয়ে কেউ রুকন হন না। দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা করার পরই কর্মী হিসাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে রুকন হন। অথচ

ইস্তিফা দেয়ার সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে অব্যাহতি চান।

আসলে তারা যে মন-মানসিকতা নিয়ে রুকন হয়েছিলেন তা হারিয়ে ফেলার কারণে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়ে তারা ছাটাই এর মধ্যে পড়ে যান।

ইস্তিফা দাতাদের মধ্যে যারা রুকনিয়াতের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেও কর্মী হিসাবে জামায়াতে নিয়মিত সামিল থাকেন তারা হয়তো আবার এক সময় রুকন হওয়ার হিম্মত পাবেন। কিন্তু যারা জামায়াত ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে ইস্তিফা দেন দ্বীনের দিক দিয়ে তাদের অধঃপতনের আশংকাই প্রবল। দ্বীনকে বুঝার পর ইসলামী সংগঠনভুক্ত হওয়া ফরয জেনে জামায়াতের রুকন হওয়ার পর শুধু একটি কারণে এ জামায়াত ত্যাগ করা জায়েয। ইকামাতে দ্বীনের যে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছিলেন, কেউ যদি ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এ জামায়াতের চেয়ে আরও উন্নত কোন সংগঠনে যোগদান করার জন্য পদত্যাগ করেন তাহলে এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে যদি কেউ দ্বীনী সংগঠন ত্যাগ করেন তাহলে হাদীস অনুযায়ী তিনি ইসলামের রশি গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলার মতো কাজ করলেন।

আর রুকনিয়াতের শর্ত লংঘন করার কারণে যাদের রুকনিয়াত বাতিল করা হয়, তাদের মধ্যে যারা অনুতপ্ত হয়ে কর্মী হিসাবে ইখলাসের সাথে কাজ করতে থাকেন তারা আবার এক সময় রুকন হয়ে যান। তাই বাতিলকৃত রুকনদেরকে টার্গেট নিয়ে আবার রুকন করার জন্য চেষ্টা করা আমাদেরই কর্তব্য। আমাদের যে ভাই কোন অপরাধের কারণে রুকনিয়াত হারিয়েছেন তার প্রতি দরদী মন নিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব।

আল্লাহর দরবারে ধরনা

যে মহান কাজের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ পাক নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন সে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের মতো গুনাহগার নগণ্য লোকদেরকে তাওফীক দান করে আমাদের মা'বুদ যে কত বড় মেহেরবানী করেছেন সে কথা স্মরণ রেখে হামেশা তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকা প্রয়োজন।

যে মেহেরবানী দ্বারা তিনি আমাদেরকে এ পথে এনেছেন সে মেহেরবানী দ্বারাই যেন আমাদেরকে এর যোগ্যতা দান করেন সে জন্য দোয়া ও চেষ্টা করতে থাকা উচিত।

দয়াময় মনিব আমাদেরকে দ্বীনের পথে এতটুকু এগিয়ে দিয়ে যে সৌভাগ্যবান করেছেন তা থেকে যেন আমরা ছাটাই হয়ে না যাই, বরং দ্বীনী যিন্দেগীর সিঁড়ি বেয়ে যেন আজীবন অগ্রসর হতে পারি সেজন্য তাঁর মহান দরবারে ধরনা দিতে থাকতে হবে। এ পথে উন্নতির কোন শেষ নেই। তাই উন্নতি হয়ে গেছে মনে করারও অবকাশ নেই।

রাহমানুর রাহীম আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের যোগ্য খেদমতের জন্য কবুল করুন, এ জামায়াতকে ইকামাতে দ্বীনের যোগ্যতা দান করুন এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে ইসলামের বিজয়ের জন্য মনোনীত করুন। আমীন ॥ ছুম্মা আমীন ॥

সমাপ্ত

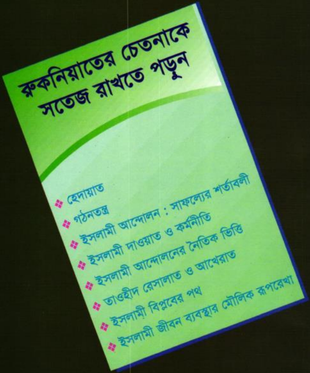

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী